MAR 21 2001

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

সাক্ষরতা-পরবর্তী শিক্ষা

আগামী পাঁচ বছরে সাক্ষরতা-পরবর্তী (পোস্ট-লিটারেসি) শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ সরকারকে ৫ কোটি ৩৩ লাখ ডলার (২৭৪ কোটি টাকা) সহায়তা দেবে বলে গত বুধবার একটি চুক্তি সই হয়েছে। সরকার ইতোমধ্যে পোস্ট-লিটারেসি অ্যান্ড কন্টিনিউইং এডুকেশন (পিএলসিই) ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প প্রণয়ন করেছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১৭ লাখ নতুন সাক্ষর ব্যক্তির শিক্ষাগত দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হবে।

বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি সই উপলক্ষে বলা হচ্ছে যে, দেশের (৪৯৫টির মধ্যে) ২৩০টি উপজেলার প্রায় ৪০ হাজার শিক্ষা কেন্দ্র এই প্রকল্পের আওতায় স্থাপন করা হবে। 'সাক্ষরতা অভিযান' (টিএলএম) কর্মসূচির অধীনে যারা সাক্ষর হয়েছেন তারা যেন 'সাক্ষর' থাকেন এবং তাদের নতুন পাওয়া শিক্ষার চর্চা করার সুযোগ পান সেজন্যই এসব কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল ট্রেনিং পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তাও এসব কেন্দ্র থেকে করা হবে বলে পরিকল্পনা করা হয়েছে। মোদ্দা কথা হলো, যেসব নিরক্ষর মানুষ সাক্ষর হয়েছেন, তারা যেন উন্নত জীবনে প্রবেশ করতে পারেন তার জন্য সাহায্য করা হবে।

সাক্ষরতা-পরবর্তী এবং 'অব্যাহত শিক্ষা' কর্মসূচি একেবারে নতুন প্রকল্প নয়। বছর তিনেক আগে এ ব্যাপারে কর্মশালা করা হয়েছিল। কর্মসূচি চূড়ান্ত করার জন্য টেকনিক্যাল গ্রুপ করা হয়েছিল। গত বছর জানুয়ারি থেকে 'পাইলট' প্রকল্প হিসেবে বেশ কয়েকটি শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এগুলোর ওপর সমীক্ষা আমাদের গোচরে না আসলেও আমরা ধরে নিচ্ছি এগুলোর ইতিবাচক ভূমিকা দেখে বিশ্বব্যাংক প্রকল্পে টাকা দিতে রাজি হয়েছে।

এর আগে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে ৭৫টি থানায় হাজারখানেক 'গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্র' চালু করার কথা শোনা গিয়েছিল। এসব মিলন কেন্দ্রে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রপত্রিকা এবং অন্যান্য বইপুস্তকের মাধ্যমে নবসাক্ষরদের পড়াশোনার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছিল। এগুলোর কটা ঠিকমত চলছে তারও খবর আমরা পাইনি। গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে এই কেন্দ্রগুলোকে দক্ষ করে তোলা উচিত।

সরকার চাচ্ছেন, সাক্ষরতা অভিযানের মাধ্যমে সাক্ষরতার হার বর্তমানের ৬০ শতাংশ থেকে ২০০২ সালে ৮০ শতাংশে উন্নীত করা হোক। কিন্তু নতুন সাক্ষর ব্যক্তিরা যদি আবার নিরক্ষর হতে থাকে তবে সব হিসাব গোলমাল হয়ে যাবে। আমরা যত দূর জানি, সাক্ষর করার ৯ মাসের ভেতরে আবার শিক্ষার্থীদের জন্য তিন মাসের কর্মসূচির মাধ্যমে অক্ষরজ্ঞান ব্যবহারের সুযোগ দেয়া হয়। যে ৪০ হাজার শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে তা 'অব্যাহত শিক্ষা' বা কন্টিনিউইং এডুকেশনের কেন্দ্র হয়ে থাকবে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। প্রকল্পের পাঁচ বছর মেয়াদ শেষ হলে কেন্দ্রগুলো চালু রাখার জন্য টাকা-পয়সা কোথা থেকে আসবে তা এখনই ঠিক করে ফেলা উচিত। নিরক্ষরতা থেকে সাক্ষরতা এবং সাক্ষরতা থেকে নিরক্ষরতা এদেশে চলতেই থাকবে। অতএব অব্যাহত শিক্ষার কেন্দ্রগুলো যেন অব্যাহত থাকে তার নিশ্চয়তা নিয়েই প্রকল্প শুরু হওয়া উচিত।

প্রতিটি সাক্ষর মানুষকে কার্যকরভাবে 'শিক্ষিত' বা 'ফাংশনালি এডুকেটেড' করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। দেশের গণতন্ত্রকে অর্থবহ করা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য কার্যকর শিক্ষিত জনগোষ্ঠী প্রয়োজন। কাজটা কঠিন। আমরা যে ভিত্তি থেকে শুরু করছি সে ভিত্তিটা বড়ই দুর্বল। সে জন্য সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষার কর্মসূচি অনেক বেশি জোরদার করতে হবে। আমরা যত দূর জানি, কাজটা করার জন্য টাকা-পয়সার অভাব হবে না। বিদেশী ঋণ-অনুদানেরও অভাব হবে না। কাজটা করার জন্য জনশক্তিরও ঘাটতি নেই। সমস্যাটা হলো প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার। এদেশের কোন প্রকল্পের সাইজ বড় হয়ে গেলেই নানা ধরনের দুর্নীতি ও অযোগ্যতা ঢুকে পড়ে। মনিটরিং অসম্ভব হয়ে পড়ে। গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন নিয়ে বহুদিন থেকে জল্পনা-কল্পনা চলছে। এখন পর্যন্ত এ কাজে অগ্রগতি খুব বেশি নয়। ৪০ হাজার শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা কবে অর্জন করা সম্ভব হবে তা বলা বেশ কঠিন। স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বা শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে টাকা-পয়সা বরাদ্দের সমস্যা যেমন নেই, তেমনি এদের সঙ্গে রাজনীতিরও সম্পর্ক নেই। অতএব নির্বাচনী হাওয়া এদের কাজে প্রভাব ফেলবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস।

এ দুটি প্রকল্পই মানব উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য জরুরি।